দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার, ২১শে চৈত্র, ১৩৯৪

04 APR 1988

033

শিক্ষিত বেকারের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা

বেকারত্ব যদি অভিশাপ হয়ে থাকে তাহলে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বলতে হবে যে এই অভিশাপের বোঝা ক্রমান্বয়ে ভারী হয়ে উঠছে। অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে যে, বোঝাটা সমাজের জন্য অসহনীয় মাত্রায় চলে গেছে।

শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে সামগ্রিক বেকারত্বের অবস্থা সহজেই অনুমান করে নেয়া যায়। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের '৮৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সরকারী শূন্য পদের সংখ্যা যেখানে বছর বছর কমে আসছে বা কমিয়ে ফেলা হচ্ছে সেখানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে।

ক্যাডারভুক্ত শূন্যপদ এবং বি সি এস পরীক্ষার প্রার্থীদের সংখ্যা দেখলে চিত্রটা পরিষ্কার হবে। ১৯৮২ সালে যেখানে শূন্যপদ ছিল ২ হাজার ৫৩১টি সেখানে বিসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৩৯৩। আর ১৯৮৬ সালে শূন্য পদের সংখ্যা ২ হাজার ২৯৮টিতে নেমে এলেও আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩১ হাজার ৫৩৪।

ক্যাডারভুক্ত শূন্য পদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ বোঝা কঠিন নয়। নিয়মিত বি সি এস পরীক্ষা না হওয়ায় প্রথমদিকে অনেক পদ শূন্য ছিল। কিন্তু ৮২ সাল থেকে মোটামুটি নিয়মিতভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় অধিকাংশ শূন্যপদ পূরণ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সৃষ্ট ক্যাডারভুক্ত শূন্য পদও প্রায় ক্ষেত্রেই পূরণ হয়ে গেছে। ফলে শূন্যপদের সংখ্যা কমে গেছে অথচ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে নতুন নতুন ছাত্র-ছাত্রী পাস করে বের হতে থাকায় এবং আগে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থান না হওয়ায় আবেদনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করে সাধারণতঃ তারাই যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত এবং যাদের শিক্ষাগত রেকর্ড তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল। খারাপ রেকর্ডের অধিকারীরা ত আবেদন করারই যোগ্য নয়। মাঝারি মানের অনেকেও বিসি এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে ভরসা পায় না। তাছাড়া বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবার কারণে বেকার থাকা সত্ত্বেও অনেকে আবেদন করতে পারে না। এই হিসাবে বলা যায় বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রধারী বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা তৃতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রীধারী বেকারদের সংখ্যা যে তাদের চেয়ে অনেক বেশী সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া ক্যাডার বহির্ভূত সকল সরকারী পদে গত তিন বছর ধরে নতুন নিয়োগ কার্যত বন্ধ। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যখন ক্রমাগত বাড়ছে, সেশন জটের কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারী চাকরির বয়ঃসীমা পেরিয়ে যাচ্ছে তখন সরকার তার চাকরি বা কর্মসংস্থানের দরজা বন্ধ করে রাখছেন।

সরকার শুধু বেতন দেওয়ার জন্য অযথা সরকারী চাকরিতে লোক নিয়োগ করবেন, একথা আমরা বলি না। তবে যেখানে নতুন লোক দরকার সেখানে নিয়োগ বন্ধ রাখার কোন যুক্তি নেই। দীর্ঘদিন ধরে অনেক পদ শূন্য পড়ে থাকা সত্ত্বেও এগুলো পূরণ না করায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত হচ্ছে, তেমনি কাজেরও অসুবিধা হচ্ছে।

প্রয়োজনের তুলনায় দেশে শিক্ষিত জনশক্তি বা লোকের সংখ্যা বেশী একথা কেউ বলবেন না। অথচ দেশের শতকরা ৫০ জন শিক্ষিত লোকই যদি বেকার থাকতে বাধ্য হয় তো বলতেই হবে সরকারের জনশক্তি পরিকল্পনায় মারাত্মক গলদ রয়ে গেছে।

আগে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করা হতো। কিন্তু অনেক চিকিৎসক প্রকৌশলী ভেষজবিদও যখন চাকরি পাচ্ছেন না তখন বুঝতে হবে বেকারত্বের অভিশাপ সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে।

সকল শিক্ষিত তরুণ-তরুণী সরকারী চাকরি পাবে এমন দাবী আমরা করতে পারি না। কিন্তু বাস্তব সত্যিটা হচ্ছে, সরকারের বেসরকারীকরণ নীতি যত সম্প্রসারিত হচ্ছে বেসরকারী খাতে কর্মসংস্থান সে হারে বাড়ছে না। বিরাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান বরং আগের তুলনায় কমে যাচ্ছে। সরকারী আশাবাদ এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যদি দেশে বেসরকারী খাতে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটতো তাহলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এত বাড়তো না।

শিক্ষিত তরুণ সমাজের "গোল্লায়" যাওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে কর্তৃপক্ষকে আক্ষেপ করতে দেখা যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়েও যে তরুণ চাকরি পায় না, সৎপথে ব্যবসা-বাণিজ্যে ঢুকতে পারে না অধ্যয়নরত যে ছাত্রছাত্রী সামনে কোন ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না, "গোল্লায়" যাবার রাস্তা সমাজই কি তাদের জন্য প্রশস্ত করে দিচ্ছে না? শিক্ষিত তরুণদের বিপথগামী হবার এটি যে একটি প্রধান কারণ তা মেনে নিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে কেবল আক্ষেপ আর উপদেশবাণী উচ্চারণ করলে হতাশা-নৈরাশ্যের অবসান হবে না। যে শিক্ষিত তরুণরা দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল তাদের একটা বড় অংশ যদি বেকারী ও হতাশায় ডুবে যায় তাহলে আশা করার থাকে কতটুকু?